আর্ট অব কেস টেকিং এণ্ড প্রেসক্রাইবিং

ডাঃ এস. হাসান

বিষয়সূচি

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

হোমিওপ্যাথি ১৫

> ১. হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন ১৬

> ২. কোন আরোগ্য কাম্য ২০

> ৩. হোমিওপ্যাথি হচ্ছে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া ২২

> ৪. হোমিওপ্যাথি আর্ট ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

লক্ষণ ও লক্ষণসমষ্টি ২৪

চিহ্ন ২৫

লক্ষণ ২৫

চিহ্ন ও লক্ষণের পার্থক্য - - - ২৬

লক্ষণের শ্রেণীবিভাগ ২৭

ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ - - - ২৮

বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ ২৮

সহগামী লক্ষণ - - - ২৮

প্রকৃত লক্ষণ ২৮

শারীরিক লক্ষণ - - - ৩০

মানসিক লক্ষণ ৩০

মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব - - - ৩০

অতিরিক্ত লক্ষণ ৩২

কমপেনসেটেড লক্ষণ - - - ৩২

প্রকৃত এবং কমপেনসেটিভ লক্ষণ ৩৩

ওষুধ নির্বাচনে কিছু লক্ষণ অপ্রয়োজনীয় - - ৩৩

আবেগজনিত লক্ষণ ৩৪

অদ্ভুত লক্ষণ - - - ৩৪

চরিত্রগত লক্ষণ ৩৫

কোন লক্ষণের প্রতি নজর দিতে হবে - - ৩৬

লক্ষণসমষ্টি ৩৬

ওষুধ নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ, লক্ষণের মূল্যায়ন ৩৮

লক্ষণের গ্রেডিং ৩৯

প্যাথিলজিক্যাল লক্ষণগুলো জরুরি নয় ৪২

প্যাথিলজিক্যাল লক্ষণ সম্পর্কে এলিজাবেথ রাইটের ভিন্ন কথা ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়
রোগী পরীক্ষা ৪৭
এনামোনেসিস- ৪৮ , ডায়াগনসিস- ৪৯ , ডায়াগনসিস এবং এনামোনেসিসের পার্থক্য- ৪৯।
রোগীলিপির উদ্দেশ্য ৫০
রোগীলিপির প্রয়োজনীয়তা ৫০
রোগীলিপি লিখে নেয়া বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ৫১
রোগীলিপি প্রণয়নে মেটেরিয়া মেডিকার জ্ঞান প্রয়োজন ৫১
রোগীলিপি প্রণয়নে চিকিৎসকের আবশ্যকীয় গুণ ৫৩
রোগীলিপি গ্রহণের পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৫৩
রোগীলিপি প্রণয়নে যারা সাহায্য করে ৫৪
আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসাবাদ ৫৫
চিকিৎসক স্বয়ং যা পর্যবেক্ষণ করবেন ৫৬
তাপ ও নাড়ির সম্পর্ক- ৫৬, নাড়ির গতি বোঝার স্থান- ৫৭, নাড়িতে দেখার বিষয়গুলো- ৫৭, জিহ্বার স্বাদ সম্পর্কে অনুসন্ধান- ৫৭, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ সম্পর্কে জানতে হবে- ৫৮।

চতুর্থ অধ্যায়
রোগীলিপি গ্রহণ ৫৯
রোগীলিপি লেখার পদ্ধতি, মাঝে ফাঁক রেখে লিখুন : ৬১
রোগীলিপি গ্রহণ পদ্ধতি ৬১
দৃষ্টি দিতে হবে লক্ষণের গভীরে মূল প্রকৃতিগত অবস্থানে ৬৩
রোগীকে প্রশ্ন করার কৌশল ৬৪
গোপন তথ্য জানার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে ৬৪
অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলো ৬৫
রোগীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে ৬৭
শরীর ও মন একসূত্রে গাঁথা ৬৭
রোগীর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের খোঁজ নিতে হবে ৬৮
রোগীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অসংগতি খুঁজতে হবে ৬৯
রোগীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধেও জানতে হবে ৭০
ছদ্মবেশী লক্ষণ- সভ্যতা লক্ষণকে চাপা দেয় ৭১
মানুষের শখ এবং আগ্রহগুলো প্রকৃত লক্ষণ ৭২
রোগীর পেশা এবং তার কর্মক্রিয়া বিবেচনা করতে হয় ৭৩
রোগী কীভাবে কথা বলে, খেয়াল করুন ৭৪
চরম পরিস্থিতিতে আসল চরিত্র প্রকাশিত হয় ৭৪

খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি রোগীর আকাঙ্ক্ষা ও অনীহার গুরুত্ব ৭৫
পিপাসা লক্ষ্য করুন ৭৭
স্বপ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান ক্ষেত্র– ফারুখ জে. মাস্টার-এর উপলব্ধি ৭৮
অতীত এবং বর্তমান রোগের ইতিহাস গ্রহণ প্রয়োজন ৯০
মায়ের গর্ভকালীন লক্ষণগুলো গুরুত্বপূর্ণ ৯২
রোগীর শিশুকালের ইতিহাস নিতে হবে ৯২
লক্ষণ ক্রমবিকাশের ধারাটি বোঝা উচিত ৯৩
বংশগত রোগের ইতিহাস গ্রহণ ৯৪
রোগীলিপি প্রস্তুতে ধাতু প্রকৃতি ও আচরণের গুরুত্ব ৯৫
হ্রাস-বৃদ্ধির গুরুত্ব ৯৫
আবহাওয়া পরিবর্তনে সংবেদনশীলতা ৯৬
রোগীর সামাজিক বা পেশাগত অবস্থানের সাথে লক্ষণটি সংগতিপূর্ণ কিনা ৯৬
আচরণ লক্ষ্য করতে হবে ৯৭
প্রতিষেধক বিষয়ে অনুসন্ধান– ভিথোলকাসের মতামত ৯৮
মন বা মানসিক ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ১০১
মানসিক অবস্থার বিচার করতে হবে বাস্তবতার নিরিখে ১০২
চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে কিনা তার অনুসন্ধান করতে হবে ১০৩
চরিত্রগত লক্ষণগুলো অনেক সময় আলাদা করা যায় না ১০৪
লক্ষণ অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে ১০৬
রোগীর প্রশ্নগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ১০৮
রোগীর বিভিন্ন মন্তব্যগুলো সমান গুরুত্বের ১০৯
লক্ষণসমগ্র আসলে একটি লক্ষণ– রাজন শংকরণ বলেন কেসটি উপলব্ধি করতে ১১০
লক্ষণটি অবস্থানগত কারণে নাকি প্যাথলজিক্যাল না আসল ১১৩
শ্রেষ্ঠ কৌশল রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকা ১১৪
কেস টেকিং এর মূলকথা ১১৫
জর্জ ভিথোলকাসের লক্ষণ মূল্যায়ন ১১৭
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ চিহ্নিতকরণ ১২৩
রোগীলিপি সম্পর্কে ভিথোলকাস ১২৭
জটিল রোগী : ১৩৩
ক. ভিরু, সংবেদনশীল এবং রক্ষণশীল বা গম্ভীর প্রকৃতির রোগী ১৩৩
খ. চিত্তোন্মাদ বা বিষাদবায়ুগ্রস্ত রোগী ১৩৪
গ. বুদ্ধিজীবী রোগী ১৩৪
ঘ. স্বাস্থ্য বিষয়ে পড়াশুনা করা রোগী ১৩৫
ঙ. মেটেরিয়া মেডিকা পড়া শিক্ষিত রোগী ১৩৫
চ. পূর্বে ওষুধ সেবনকারী জটিল রোগী ১৩৬

ছ. স্থানীয় ও একদৈশিক রোগ আর একটি জটিলতা ১৩৬
জ. ক্রনিক রোগীর রোগীলিপির জটিলতা ১৩৭
রোগীলিপি সম্পর্কে ১৩৯
ক. রোগীলিপি : কেন্টের সারমর্ম ১৩৯
খ. এইচ এ রবার্ট এর নির্দেশনা ১৩৯
গ. স্টুয়ার্ট ক্লোজ এর নির্দেশনা ১৪০
ঘ. এলিজাবেথ রাইট এর নির্দেশনা ১৪১
ঙ. ক্রনিক ও একিউট (তরুণ) রোগীলিপির পার্থক্য ১৪১

পঞ্চম অধ্যায়
একিউট রোগীলিপি ১৪৩

প্রফেসর জর্জ ভিথোলকাস-এর একিউট রোগীলিপি ১৪৪
ডা: প্রফুল বিজয়াকার এর একিউট প্রেসক্রাইবিং ১৪৬
ফারুখ জে. মাস্টার-এর একিউট (তরুণ) প্রেসক্রাইবিং ১৫৪
এ্যাডভান্স প্যাথলজিযুক্ত একিউট রোগে প্রেসক্রাইবিং ১৫৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
শিশু রোগী ১৬৪

শিশু রোগী ১৬৫
নবজাতকদের রোগীলিপি ১৬৫
শিশু চিকিৎসা ১৭০

সপ্তম অধ্যায়
কেস এনালাইসিস ১৭৫

ভিথোলকাসের কেস এনালাইসিস ১৭৫
রবিন মার্ফির কেস এনালাইসিস ১৭৯
রাজন শংকরণের কেস এনালাইসিস ১৮৬

অষ্টম অধ্যায়
প্রেসক্রাইবিং ১৯১

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি- ১৯২
ক্ল্যাসিকাল হোমিওপ্যাথি ২০২
ক্ল্যাসিকাল বা ধাতগত প্রেসক্রাইবিং ২০৬
চরিত্রগত লক্ষণসমগ্রের ভিত্তিতে প্রেসক্রাইবিং ২১২
বনিং হাউসেন মেথড ২১৬
শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে প্রেসক্রাইবিং ২২০
কারণভিত্তিক প্রেসক্রাইবিং ২২১
ড্রেইনেজ বা নিষ্কাশন পদ্ধতি ২২৫
মায়াজমভিত্তিক প্রেসক্রাইবিং- ২৩০

পছন্দ অপছন্দের গুরুত্ব ২৪০
দুই রুব্রিক দিয়ে প্রেসক্রিপশন ২৪১
কি নোট প্রেসক্রাইবিং ২৪৩
ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রেসক্রাইবিং ২৪৬
ভ্যাক্সিনোসিস মায়াজমের ভিত্তিতে প্রেসক্রাইবিং ২৪৮
স্পেসিফিক প্রেসক্রাইবিং ২৪৯
ড্রাগ মায়াজম বা কৃত্রির চিররোগের ভিত্তিতে চিকিৎসা ২৫২
সিনথেটিক মেথড ২৫৫
সেনসেশন মেথড ২৫৯
সেগাল মেথড ২৭৪
ওষুধ নির্বাচন সম্পর্কে রাজন শংকরণ ২৭৯

নবম অধ্যায়
রেপার্টরিকরণ ২৮৭

রেপার্টরির প্রয়োজনীয়তা ২৮৮
রোগীর ভাষাকে রুব্রিকে রূপান্তর করা ২৯০
রেপার্টরিকরণ-এর জন্য কয়েকটি টিপস ২৯২
ক. সবসময় রেপার্টরি পড়া উচিত ২৯২
খ. একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে হয় ২৯২
গ. অনেক সময় এক লক্ষণের জন্য দুটি রুব্রিক নেয়া ভালো ২৯২
ঘ. অদ্ভুত লক্ষণের দিকে নজর রাখতে হবে ২৯৩
ঙ. রোগীর কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে রুব্রিক নির্বাচন করতে হয় ২৯৩
চ. কয়েকটি সমস্যা ২৯৪
ছ. এক অধ্যায়ে না পেলে বিকল্প অধ্যায় দেখুন ২৯৪
সফল রেপার্টরিকরণের কৌশল : ভিথোলকাস ২৯৬

দশম অধ্যায়
ওষুধের শক্তি নির্বাচন ৩০৩

ওষুধের শক্তি নির্বাচন ৩০৩
নবীন চিকিৎসকদের জন্য আশার কথা ৩০৬
একিউট রোগে শক্তি নির্বাচন ৩০৭
ওষুধের শক্তি নির্বাচন প্রসঙ্গে রাজন শংকরণ ৩০৮

একাদশ অধ্যায়
দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্র ৩১২

হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধি ৩১৪
হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির ভাবীফল ৩১৪
হোমিওপ্যাথিক বৃদ্ধির কারণ ৩১৫

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন ৩১৫
দ্বিতীয় ব্যবস্থাপত্রের মহামূল্যবান নীতি ৩১৬
ওষুধের ক্রিয়া পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপত্র ৩১৭

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

রাজন শংকরণের রোগীলিপি ছক ৩২৬

প্রথম অধ্যায়

হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন

কোন আরোগ্য কাম্য

হোমিওপ্যাথি হচ্ছে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া

হোমিওপ্যাথির আর্ট

প্রথম অধ্যায়
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন

আজ কথা উঠেছে- যারা স্বাস্থ্য সচেতন, যারা তাদের স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, সবচেয়ে কম ঝুঁকি নিয়ে তা ফিরে পেতে চান, তারা একটা নির্ভরযোগ্য পথ খুঁজছেন, খুঁজছেন একটি বিশ্বস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি। এজন্যই হোমিও চিকিৎসা পদ্ধতি আবার নতুন করে সামনের দিকে চলে আসছে।

আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি। ক্রনিক রোগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগযুগ ধরে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অসহায়। শুধু কিছু কিছু উপশমকারী ওষুধ দিয়ে সাময়িক একটু আরাম দেয়া ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারছে না। এতে প্রকোপটি সামান্য কমিয়ে রাখা যাচ্ছে মাত্র। তাও, অসংখ্য রোগাক্রান্ত মানুষের মধ্যে নগণ্য এ একটা অংশমাত্র এই উপশম পাচ্ছে। এর সাথে যোগ হচ্ছে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নামের এক ভয়ংর অভিশাপ। ফলে সমস্ত মানবগোষ্ঠীই এক মহাসংটের সম্মুখীন। যারা চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবেন, এ বিষয়টি তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

যেকোন অবস্থায় মানবসত্তা একটি পূর্ণ সমন্বিত অস্তিত্ব। প্রচলিত চিকিসা ব্যবস্থায় এ সত্যটিকে মানা হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষকে ভাগ ভাগ করে বিচার করে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন-এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি মনোবিজ্ঞান, বায়োলজি, মলিকুলার বায়োলজি, বায়োফিজিক্স, রসায়ন ইত্যাদি শাখা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পৃথক পৃথকভাবে বিচার করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান এসব বিজ্ঞানের তথ্যগুলো নিয়েই গড়ে উঠেছে। ফলে কতকগুলো খণ্ডিত ধারণা এসে জমা হয়েছে মাত্র। সবগুলো ধারণার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তারূপ ফুটে উঠেনি। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, তার ভেতর ঘটে চলা রাসায়নিক ক্রিয়াগুলো, বিভিন্ন তন্ত্রের সুশৃঙ্খল কর্মসম্পাদন, আবেগ মনের দোলাচাল, এগুলোর কোনোটিকেই স্বাধীন ভাবা যায় না। সম্পূর্ণ মানুষটি একটি একক সত্তা। চিকিৎসাবিজ্ঞান মানবসত্তাকে এভাবে এখনও বিচার করতে পারে নি। তাই বলে, ফুসফুস আক্রান্ত হয়েছে তো ফুসফুসের ওষুধ দাও, কানে সমস্যা তাহলে ওষুধ দাও কানের জন্য। এভাবে যে চিকিৎসা তা অবশ্যই আংশিক চিকিৎসা-খণ্ডিত চিকিৎসা। সার্বিক চিকিৎসা নয়। সামগ্রিক বা হলিস্টিক চিকিৎসা

করতে হলে চিকিৎসা করতে হবে একক সত্তার। তা না হলে সম্পূর্ণ এবং প্রকৃত আরোগ্য হবে না।

মানবসত্তা যে অসুস্থতার ক্ষেত্রেও একটি পূর্ণ একক অস্তিত্ব তা বোঝার জন্য আমরা একটি উদাহরণ বিবেচনা করব। মনে করি একজন মা এবং তার মেয়ে, এ দুজনের মধ্যে লাগালাগি সম্পর্ক। তাদের অবচেতন মনে একটা প্রতিযোগিতা ও হিংসা ইত্যাদি কারণে। এমন অবস্থায় আমরা কন্যার প্রতিক্রিয়াগুলো যদি পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব- কন্যাটির মধ্যে আবেগ জড়িত একটা উত্তেজনা কাজ করে, একারণে মায়ের স্বাভাবিক আচরণগুলোও আর তার কাছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়, তা থেকে মনের মধ্যে গভীর বেদনাবোধ সৃষ্টি হতে পারে। এরকম অবস্থা যদি মেয়েটির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে তবে সে তার স্বাভাবিকতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে থাকবে, তার দেহ মনে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তা হতে পারে–

ক. যদি মেয়েটি পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী হয় তবে আবেগের এই চাপ সে সহজেই কাটিয়ে উঠবে, দেহের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে তা অতিক্রম করতে পারবে না, ফলে তার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে না।

খ. যদি মেয়েটি যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী না হয় তবে ঐ চাপের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার অনুভূতি তার দেহে প্রকাশিত হবে– হতে পারে তা ব্রণ বা একজিমা বা ডিওডেনাল আলসার ইত্যাদি নানারূপে। এক্ষেত্রে দেহের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা, তার চেয়ে আবেগজনিত চাপ শক্তিশালী। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোগের কারণ বা প্রভাবক হচ্ছে আবেগজনিত, কিন্তু প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে দেহ স্তরে।

গ. মেয়ের স্বাস্থ্য যদি 'খ' তে বর্ণিত অবস্থার চেয়ে আরো খারাপ থাকে, তবে তার মধ্যে আরো কিছু কষ্টকর লক্ষণ দেখা দিতে পারে, তার মনে সৃষ্টি হতে পারে গভীর অবিশ্বাস, অনীহা বা নিসঙ্গতা এবং সব শেষে বিষণ্নতা। এক্ষেত্রে রোগের কারণ আবেগজনিত এবং লক্ষণও প্রকাশিত হয়েছে একই স্তরে।

ঘ. মেয়েটির স্বাস্থ্য যদি বংশগত প্রবণতার কারণে খুবই খারাপ হয় তবে তার দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ উপরিক্ত সমপরিমাণ চাপেই আরও

বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, তার মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে। সে স্কুলে মনোযোগ দিতে পারবে না। ক্লাসে নম্বর কমতে থাকবে, হৃদয়ঙ্গম ক্ষমতা কমে যাবে। এরকম চলতে থাকলে সে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা দেখব আবেগের মাধ্যমে গৃহীত চাপের ফল মানসিক স্তরে প্রকাশ পেল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাহ্যিক চাপগুলো দেহ, আবেগ ও মন এসব স্তরে অবস্থাভেদে স্থানান্তরিত হতে পারে। অর্থাৎ মানবসত্তা একটি পূর্ণ সমন্বিত অস্তিত্ব। আবেগ ও মন বাদ দিয়ে দেহ আলাদা নয় বা দেহ ও আবেগ বাদ দিয়ে মন আলাদা নয়।

একটি ভেক্টর ফোর্স দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে । হোমিওপ্যাথরা একে বলে জীবনীশক্তি। জীবনীশক্তি লক্ষণগুলোকে দেহ, মন বা আবেগ এসব স্তরে প্রকাশ করে। প্রাকৃতিকভাবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় দেহের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনকভাবে। শক্তির স্থানান্তর বা রূপান্তর সম্ভব বলেই এমনটি ঘটতে পারে।

প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে জীবানুকে দায়ী করা হয়। চিকিৎসা করা হয় ঐ জীবাণু ধ্বংসের জন্য। যেসব রোগের কারণে হিসাবে জীবানুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা অসহায়। আসলে রোগের মূল কারণ জীবাণু নয় বা প্রচলিত চিকিৎসায় যা মনে করা হয় তাও নয়, বিষয়টি আরো গভীর ও সূক্ষ্ম। আমরাতো কোটি কোটি রোগজীবাণু পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করছি, তবে সবার রোগ হয় না কেন? তাহলে নিশ্চয়ই দেহের ভেতর এমন একটা কিছু আছে যা বিশেষ রোগ সৃষ্টির কারণ হিসাবে কাজ করে। আবার একটি উদাহরণ বিবেচনা করব– ধরা যাক, চার বন্ধু মিলে বর্ষার নতুন পানিতে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করল। বিকেলে দেখা গেল ১ম বন্ধুর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ২য় বন্ধুর শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, হালকা জ্বরও আছে। ৩য় বন্ধুর প্রবল জ্বর, হাত-পা ঠাণ্ডা কিন্তু মাথা গরম, চোখমুখ লাল হয়ে গেছে, নাক দিয়ে পানি ঝরছে। ৪র্থ বন্ধুটির অবস্থা আরো করুণ, সে বিছানায় পড়ে গেছে, নড়াচড়া করতে পারছে না, প্রচণ্ড কাশি, মাথা নাড়তে কষ্ট। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আমরা আশেপাশে দেখতে পাই। একই যাত্রায় এরকম পৃথক ফল কেন? এর উত্তর যদি আমরা খুঁজতে যাই তবে অবশ্যই

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধ কার্যক্রমের অস্তিত্ব খুঁজে পাব। এ কার্যক্রমের অবস্থানগত ও গুণগত তারতম্যের কারণেই উত্তেজক বা প্রভাবক এক হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষে পৃথক পৃথক রোগ লক্ষণ উৎপাদিত হয় বা কাউকে রোগ স্পর্শ করতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে প্রবণতা। দেহে রোগ প্রবণতা বা স্থুলভাবে বললে বিশেষ রোগ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকে তবে তার রোগ হবে না। অর্থাৎ জীবাণু একা রোগ উৎপাদন করতে পারে না এজন্য প্রয়োজন ঐ রোগের প্রতি প্রবণতা বা বিশেষ দুর্বলতা। মানুষের স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত এই প্রবণতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন অবস্থায় থাকে। এই যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা ও প্রবণতা–প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় ওষুধ প্রয়োগের সময় তার কোনো বিবেচনা করা হয় না। ফলে রোগের একটা নাম ঠিক করে ঐ রোগে সবার জন্য একই ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা বিবেচনা না করে, নির্বিচারে ওষুধ প্রয়োগের কারণে মানবদেহে অতিমাত্রায় অপ্রয়োজনীয় ওষুধ প্রবেশ করে এরা অনুপ্রবেশকারী রাসায়নিক পদার্থ মানব স্বাস্থ্যের বিপর্যয় ঘটিয়ে চলে। এগুলো থেকেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বিষয়টিকে যদি অতি সাধারণভাবে বর্ণনা করি তবে দেখি, যখন দেহে অনুপ্রবেশকারী শক্তির সাথে দেহের প্রতিরোধ কার্যক্রম পরাস্ত হয় তখন দেহ রোগাক্রান্ত হয়। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া হচ্ছে প্রতিরোধ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেহকে সবসময় রোগমুক্ত রাখা। সে লক্ষ্যেই এ শক্তি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তারই ফলশ্রুতিতে দেহে তখন ভাইরাস বা ব্যাসিলি প্রবেশ করে তা মেরে ফেলার জন্য দেহের ভিতর তাপ সৃষ্টি হয়। ফুসফুসে বাসাবাঁধা রোগ জীবাণুকে কফের মাধ্যমে বের করে দেবার জন্য কাশি সৃষ্টি হয়। দেহের এই প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে একটি শক্তি। রোগ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার কারণেই দেহে লক্ষণ সৃষ্টি হয়। আমরা বলি জ্বর বা কাশি হয়েছে। এই যে, রোগ লক্ষণের উদ্ভব তা কিন্তু দেহকে নীরোগ করার জন্য দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্রিয়ার ফল। যা নিয়ন্ত্রিত হয় কম্পিউটারের চাইতেও অতি উচ্চস্তরের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শক্তির দ্বারা। এটি প্রাকৃতিক নিয়মে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। হ্যানিম্যান এই শক্তির নাম দিয়েছেন জীবনীশক্তি। আর রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম হচ্ছে জীবনীশক্তির একটি কাজ।

কোন আরোগ্য কাম্য

এই যে রোগাবস্থা তা থেকে আরোগ্যের উপায় কি? দুটো পথ খোলা আছে আমাদের সামনে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক **হিপোক্রেটিস** এ দুধরনের চিকিৎসার কথাই বলেছেন।

ক. প্রাকৃতিক প্রতিরোধ কার্যক্রমের স্বপক্ষে কাজ করে এমন ওষুধ প্রয়োগ।

খ. প্রাকৃতিক প্রতিরোধ কার্যক্রমের ফলে উৎপন্ন লক্ষণ দূর করার জন্য প্রতিরোধ ক্রিয়ার বিপক্ষে ওষুধ প্রয়োগ।

প্রথম ধারাটি হচ্ছে, আরোগ্য হবে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়েই। তবে তাকে শক্তিশালী করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এমনভাবে শক্তি বৃদ্ধি করা যাতে তা রোগ প্রতিরোধক শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে।

দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্রিয়ার দ্বারা দেহকে রোগমুক্ত করার প্রচেষ্টার ফলে উৎপন্ন লক্ষণ যেমন- জ্বর, কাশি, এসব লক্ষণনাষক ওষুধ প্রয়োগ করে।

প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বিতীয় ধারাটি অনুসরণ করে। অর্থাৎ জ্বর হয়েছে তো জ্বরের ওষুধ দাও। কাশিতে কাশি বন্ধের ওষুধ দাও। জীবাণুকে মেরে ফেলার ওষুধ দাও। এই যে জ্বর বা কাশির লক্ষণ দেখছি, এর অন্তর্নিহিত মঙ্গল উদ্দেশ্যকে বিবেচনা আনা হয় না। এতে কি হয়? প্রাকৃতিক নিরাময় ধারার বিপরীতে ওষুধ প্রয়োগ করা হয়, ফলে কাশি বা জ্বর ভালো হলেও জীবনীশক্তির উপর একটি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে প্রতিরোধ কার্যক্রম দুর্বল হয়ে যায়। মানব স্বাস্থ্য আরও হুমকির সম্মুখীন হয়। দেখা দেয় পার্শ্বপ্রক্রিয়া। এরূপ চলতে চলতে দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা একসময় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং ক্যানসার, এইডস এর মতো দুরারোগ্য রোগের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় মানবগোষ্ঠীকে। এ অবস্থা যতদিন চলতে থাকবে–মানবদেহ ততই নতুন নতুন স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। এজন্যই আমরা দেখছি, একের পর এক এন্টিবায়োটিক ওষুধ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, প্রয়োজন হচ্ছে নতুন নতুন উচ্চশক্তিসম্পন্ন ওষুধ। ক্রমশই উচ্চ শক্তির ওষুধ, নতুন নতুন প্রজন্মের এন্টিবায়োটিক ওষুধ শক্তির এই উচ্চ হার কি মানবস্বাস্থ্যের

ক্রমঅবনতি নির্দেশ করে না? পক্ষান্তরে দেহের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ কার্যক্রমের স্বপক্ষে কাজ করে এমন ধারা অনুসরণ করলে আমরা এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারি।

প্রচলিত চিকিৎসায় ওষুধ যেভাবেই দেহে প্রবেশ করানো হোক না কেন (বড়ি, ইনজেকশন, সিরাপ ইত্যাদি) লিভার ও কিডনির এনজাইমগুলো ওষুধকে পরিপাক করে ওষুধের এ্যাকটিভ প্রিন্সিপালকে রক্তে সঞ্চার করে এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ কিডনির মাধ্যমে দেহ থেকে বের করে দেয়। এর ফলে লিভার ও কিডনির উপর বাড়তি চাপের সৃষ্টি হয়। যদি কারও লিভার ও কিডনির দুর্বলতা থাকে তবে অবস্থা আরও খারাপ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের কাম্য হচ্ছে দেহের প্রতিরোধ কার্যক্রমের, অর্থাৎ জীবনীশক্তির স্বপক্ষে ক্রিয়া করে এমন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা এবং ওষুধটি যেন কিডনি, লিভার বা অন্যকোনো দেহাঙ্গে বাড়তি চাপ সৃষ্টি না করে।

হোমিও ওষুধ দেহের জীবনীশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, ফলে তার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং তা রোগ শক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে দেহকে রোগ মুক্ত করে। হোমিও ওষুধ কাজ করে সম্পূর্ণ শক্তিস্তরে। পৃথক পৃথক দেহাঙ্গে নয়, একক মানবসত্তায়। তাই লিভার বা কিডনির উপর তা কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। হোমিও ওষুধ তাই অন্য কোনো ওষুধের মতো নয়। এটি শক্তি ওষুধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লক্ষণ ও লক্ষণসমষ্টি

চিহ্ন

লক্ষণ

লক্ষণের শ্রেণীবিভাগ- ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ, বস্তুনিষ্ঠ লক্ষণ, সহগামী লক্ষণ, প্রকৃত লক্ষণ, শারীরিক লক্ষণ, মানসিক লক্ষণ, মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব, অতিরিক্ত লক্ষণ, কমপেনসেটেড লক্ষণ, প্রকৃত এবং কমপেনসেটিভ লক্ষণ, ওষুধ নির্বাচনে কিছু লক্ষণ অপ্রয়োজনীয়, আবেগজনিত লক্ষণ, অদ্ভুত লক্ষণ, চরিত্রগত লক্ষণ।

কোন ধরনের লক্ষণের প্রতি নজর দিতে হবে?

লক্ষণসমষ্টি

ওষুধ নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ, লক্ষণের মূল্যায়ন

লক্ষণের গ্রেডিং

প্যাথলজিক্যাল লক্ষণগুলো জরুরি নয়

প্যাথলজিক্যাল লক্ষণ সম্পর্কে এলিজাবেথ রাইট-এর ভিন্ন কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়
লক্ষণ ও লক্ষণসমষ্টি

আমরা আগেই বলছি, রোগীলিপি করা হচ্ছে একটি আর্ট, যা আমাদের দক্ষভাবে রপ্ত করতে হবে। এজন্য কিছু কিছু বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে লক্ষণ সম্পর্কে। এ অধ্যায়ে আমরা সেসব বিষয়ে জানব। কিছু কিছু সংজ্ঞা আমাদের জানা প্রয়োজন। কিছু কিছু প্রায়োগিক শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে। এ অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে সেসব কিছু বলব। রোগী লিপি প্রস্তুত করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে আমাদের মানস গঠনে যা সাহায্য করবে।

চিহ্ন

চিহ্নের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– নিদর্শন, সংকেত, ইঙ্গিত বা প্রমাণ। হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রোগীর ক্ষেত্রে চিহ্ন বলতে এমনসব নিদর্শন বোঝায় যা রোগীদেহে সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। যেমন- দেহের কোনো অংশ ফুলে যাওয়া, কোনো স্থানের বর্ণবিকৃতি ঘটা ইত্যাদি। চিহ্ন সবসময় রোগের পরিচয়বাহী প্রতিনিধি বা রোগের ভাষা নাও হতে পারে। হোমিওপ্যাথিতে এর গুরুত্ব কম। কারণ, এগুলো ওষুধ নির্বাচনের ভিত্তি হতে পারে না। চিহ্নের কারণ ও অবস্থান থাকে। তার সাথে অনুভূতি, ক্রিয়াপ্রকৃতি, হ্রাসবৃদ্ধি, আনুষঙ্গিক সহচর অবস্থা যোগ করলে তা লক্ষণে রূপান্তরিত হয়, যা হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষণ

গ্রিক শব্দ 'Symptoma' থেকে ইংরেজি শব্দ 'Symptom' বা লক্ষণ শব্দটির উৎপত্তি। যার বাংলা অর্থ 'যা কিছু ঘটে' বা 'রোগের উপসর্গ'। হোমিও দৃষ্টিতে দেখলে একে স্বাস্থ্য অবস্থার পরিবর্তন হিসাবে যা কিছু ঘটে তাকে লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। জীবনীশক্তির সুনিয়ন্ত্রণে শরীর ও মনের যে স্বাভাবিক অনুভূতি কাজকর্ম অব্যাহত ছিল, রোগ আক্রমণকালে তার পরিবর্তে অস্বাভাবিক আঙ্গিক পরিবর্তন, অনুভূতি, কাজকর্ম, আচরণ, মেজাজ প্রকাশ পায়, যা সুস্থাবস্থা থেকে ভিন্নতর। ওষুধ প্রুভিংকালেও, ওষুধের প্রভাবে জীবনীশক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। তখন পূর্বের স্বাভাবিকতা

রোগীদেহে থাকে না। অস্বাভাবিকত্ব চলে আসে। এরূপ অসুস্থ অবস্থার প্রত্যেকটি পরিবর্তনকে এক একটি লক্ষণ বলে। জীবনীশক্তি স্বয়ং এগুলো উৎপাদন করে। আমরা বলি, লক্ষণ হচ্ছে রোগের পরিচয়বাহী প্রতিনিধি বা রোগের ভাষা, একই সাথে তা ওষুধ নির্বাচনের ভিত্তি।

লক্ষণে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন কারণ, অবস্থান, অনুভূতি বা ক্রিয়া প্রকৃতি,হ্রাস-বৃদ্ধি, আনুষঙ্গিক বা সহচর অবস্থা।

চিহ্ন এবং লক্ষণের পার্থক্য

চিহ্ন হচ্ছে নিদর্শন, সংকেত, ইঙ্গিত বা প্রমাণ, আর লক্ষণ হচ্ছে 'যা কিছু ঘটে' বা 'রোগের উপসর্গ'। চিহ্ন বলতে এমনসব নিদর্শনকে বোঝায় যা রোগীদেহে সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারে। লক্ষণ সবসময় রোগীদেহে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অনেক লক্ষণ আছে যা শুধু রোগী নিজে অনুভব করে যেমন ব্যক্তিনিষ্ঠ লক্ষণ। লক্ষণগুলো কখনই চিহ্ন নয় তবে চিহ্ন কখনো কখনো লক্ষণ হয়ে উঠতে পারে। তা হয় বস্তুনিষ্ট লক্ষণ। লক্ষণের কারণ, অবস্থান, অনুভূতি বা ক্রিয়া প্রকৃতি,হ্রাস বৃদ্ধি, আনুষঙ্গিক বা সহচর অবস্থা, এসব বৈশিষ্ট্য থাকে। চিহ্নের থাকে শুধু অবস্থান ও কারণ। যখন চিহ্নের সাথে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যোগ হয় তখন তা লক্ষণে পরিণত হয়।